বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ আয়োজনে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ■ প্রকাশনা ও অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল এক স্মরণীয় দিন। আমি এই মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী সকল স্তরের জনগণ ও বিদেশি বন্ধুদেরকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার আত্মপ্রকাশ করে। এই সরকার গঠনের ফলে বিশ্ববাসী স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাথার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অবস্থান নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্ববাসীর কাছে রোল মডেল। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মাসেতু এবছরই চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ মেগাপ্রকল্পগুলোর কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০৪১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। আমি মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহবান জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনে অবদান রাখবে– এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল হামিদ

১৭ই এপ্রিল
ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
২০২২

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে। শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনদের স্মৃতির প্রতি।

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ যথাক্রমে ১৬৭টি এবং ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য রেসকোর্স ময়দানে ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শপথ গ্রহণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' – সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসময় 'আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' স্লোগান দেন। তিনি ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাবলী সারা পূর্ব বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করে। এই পরিস্থিতিতে, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে, পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে প্রেরণ করে এবং পূর্ব বাংলায় নারকীয় তাণ্ডবলীলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকার শেখ মুজিব-এর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়। মেহেরপুর হয়ে উঠে অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এবং সেদিন থেকে এ স্থানটি 'মুজিবনগর' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ ও আক্রমণ চালিয়ে মেহেরপুর দখল করে। ফলে, অস্থায়ী সরকার ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে কার্যক্রম চালাতে থাকে। নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জাতির পিতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে মাত্র নয় মাসেই একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। সাড়ে ৩ বছরের মধ্যেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীরা জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ৩রা নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ছিলনা। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা জাতির পিতা এবং জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার করেছি। পরবর্তিতে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠা করে মানবতা বিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সেই থেকে গত সাড়ে তের বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। সফলভাবে কোভিড মহামারি মোকাবিলা করেছি। আমাদের মেগাপ্রকল্পগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচ্ছি। আমরা জঙ্গি-সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমরা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন করেছি এবং এর বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে।

মুজিবনগর দিবসের ৫১ বছর পূর্তিতে আমি জাতির পিতার মহান আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাই। আসুন, ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অপশক্তির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে কাজ করি।

আমি 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল এক গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানসহ সকল শহিদ, বীরাঙ্গনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাঁদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২৫ মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতম হামলার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে এ দেশের মানুষ খুব দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে এবং দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকে চূড়ান্ত পরিণতি দেয়ার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমন্বিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। দেশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও পরিচালনাই কেবল নয়, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ন্যায়যুদ্ধ ও অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্যও একটি সরকার কাঠামোর প্রয়োজন ছিল। বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণার কেন্দ্রে ধারণ করে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক মুজিবনগর সরকার দেশপ্রেমিক মুক্তিপাগল জনতাকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি সফল জনযুদ্ধে পরিণত করেন। আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ে তারা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ফলে নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতাবিরোধীরা পরাজয়ের গ্লানি এখনও ভুলতে পারেনি। তাই বিজয় অর্জনের এত বছর পরও স্বাধীনতাবিরোধীরা ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় লিপ্ত। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা প্রতিহত করে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের মহান বীরদের প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে 'মুজিবনগর দিবস' যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

'মুজিবনগর দিবসে'র শিক্ষা ও চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঙালি জাতিকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি জোগাবে। 'মুজিবনগর দিবসে'র শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনর বাংলা' গড়তে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসটি বাঙালি জাতির জীবনের একটি ঐতিহাসিক দিন, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালের এদিনে বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এই সরকারই বাংলাদেশের প্রথম কার্যকরী সরকার। এই সরকার গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিচালনা করেছে দীর্ঘ নয় মাসের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সব কর্মকাণ্ডের যোগসূত্র হচ্ছে মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রথম আত্মপরিচয় ঘোষণার দিন হলো মুজিবনগর দিবস।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার ধারাবাহিকতায় গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশ্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংসদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়; যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নতুন দেশ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। পাকহানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী সোচ্চার হয়। তাই আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের অবদান অপরিসীম। মূলত জাতির পিতার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি।

আজকের এ বিশেষ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় চার নেতাকে যারা তার অবর্তমানে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ-কোটি দেশপ্রেমিক জনতাকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। শ্রদ্ধা জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো সকল মা-বোনকে।

লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে যে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। আমরা ২০৪১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি।

মুজিবনগর দিবসের উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খাজা মিয়া

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১: ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। রক্তাক্ষরে লেখা একটা সোনালী দিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার ঘোষণা দিলেন ২৬শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া হিংস্র সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হুকুমের দায়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে অন্তরীণ হলেন পাকিস্তানের কারাগারের পাঞ্জাবী প্রকোষ্ঠে। এক সময় উনি স্থানান্তরিত হলেন মিয়াওয়ালি জেলে। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়ে সাত কোটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি ঝাপিয়ে পড়লো পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মরণজয়ী যুদ্ধে।

জাতির জনক হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে টুকরো করে বাস্তবিক অর্থে যে স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা করলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক বানিয়ে, সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে মান্ধাতার আমলের পুরনো রাইফেলে সজ্জিত করে, একতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে একটা অসম যুদ্ধে লিপ্ত করলেন। সেই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই মাত্র ২৩ দিনের মাথায় একতাবদ্ধ বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে তাঁকে বুকে ধারণ করে তাঁর আত্মার আত্মীয় ও ঘনিষ্টতম সহকর্মীগণ তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাকে নৈতিক ও আইনি রাষ্ট্রে পরিণত করার একটা কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্বের সামনে সেই স্বাধীন রাষ্ট্র কে অভিষিক্ত করলেন ১৭ই এপ্রিল।

পাকিস্তানি কামান বিমানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, পাকিস্তানি যশোর ক্যান্টনমেন্টের নাকের ডগায় যুদ্ধরত বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে এবং পৌরহিত্যে, বাংলাদেশের যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর লড়াকু সৈনিকেরা হাজার হাজার জনগণ, পত্র-পল্লব আর প্রভাতী সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত প্রকৃতিকে হিরণ্ময় আনন্দে সাজিয়ে, ওই মাহেন্দ্রক্ষণে মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এক নিভৃত পল্লীকে অপার মহিমায় জাগরিত করে সে ঐতিহাসিক ক্ষণটি সৃষ্টি করেছিল। সে অবিন্যস্ত সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর তথা বাঙালি রাষ্ট্রনায়ক, আর ধীমান নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের অভাবনীয় কূটনৈতিক তৎপরতার ফসল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সার্বিক সহায়তাকে সম্বল করে ও তাঁর কেন্দ্রীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান রুস্তমজী, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তরক্ষী প্রধান গোলক মজুমদার, আর ২৪ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট এর সীমান্তরক্ষী প্রধান কর্নেল চক্রবর্তী ও তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় সেদিনের সেই অভিষেক অনুষ্ঠানকে পাকিস্তানের রক্তচক্ষুর বেড়াজাল থেকে ছিন্ন করে রেখেছিলেন। ফলে সেদিন পাকবাহিনী অভিষেকস্থল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করেও কুষ্টিয়া থেকে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস অথবা সুযোগ কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেনি। আর আমরা বাংলার দামাল মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সেদিন বিজয়ের কেতন উড়িয়ে ছিলাম সারা পৃথিবীকে জানিয়ে, বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি জনগোষ্ঠী ও আমাদের শুভাকাঙ্খীদের আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে আর আমাদের শত্রুদের মুখে কালিমা লেপন করে।

সেদিন প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের জাতীয় সংগীত, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, যখন অযুত কণ্ঠে জেগে উঠেছিল বৈদ্যনাথতলার সেই অজানা জনপদকে জনতা আর মুক্তিবাহিনীর পদভারে প্রকম্পিত করে, হাজার হাজার জনতার কণ্ঠস্বর যখন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান আর তারস্বরে প্রচণ্ড আবেগে তাড়িত হাজারো জয়ধ্বনি সবুজ ধানের ক্ষেত আর গাঢ় সবুজ অম্রকাননকে বিমোহিত করে পতপত ছন্দে উড্ডীয়মান লাল সবুজ আর হলুদ এর পতাকা কে প্রলম্বিত অভিবাদন জানিয়েছিল, তখন পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছিল এক অভাবনীয় হিরণ্ময় জ্যোতি। যখন অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম কে দিনের পর দিন ব্যবহৃত, ঘাম ধুলা আর রণে ক্লেদাক্ত,মলিন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও হরেক রংয়ের পাদুকা টুপি আর বেল্ট পরিহিত মুক্তিযোদ্ধাগন সামরিক কায়দায় অভিবাদন করছিল তখন ধরনী আবর্তিত হচ্ছিল সীমাহীন মূর্ছনায়। ঐ স্বল্পসংখ্যক পুলিশ ও আনছার বাহিনী যখন অভাবনীয় স্মার্ট ছন্দে রাইফেল আর হস্ত আন্দোলিত করে বেওনেটগুলো আকাশ পানে ঊর্ধ্বমুখে স্থির তরঙ্গে স্থাপিত করেছিল তখন চকচকে বেয়নেটগুলো রবি রাগে স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছিল।

মোটকথা একদিকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কে আইনি ভিত্তি দেওয়ার কাজে পার্লামেন্টের চিফ হুইপ ইউসুফ আলী চৌধুরী কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ ও সরকারের সকল সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ততা, অপরদিকে রাষ্ট্র ও যুদ্ধ পরিচালনায় সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অসাধারণ মূহূর্ত। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারের শক্তি সমন্বিত ও সুসংহত হলো। আর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রচিত হলো। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এ সকল কার্যক্রম গ্রহণ ছিল অতীব জরুরী। আর এ অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যেসকল সাহসী মানুষ গুলোর সেদিন সেখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন ছিল তারা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন চরম গোপনীয়তার মাধ্যমে রাতের শেষ প্রহরে কলকাতা প্রেসক্লাব চত্বরে। অধিকতর গোপনীয়তায় রওনা দিয়েছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশাল এক সংবাদকর্মীর দল- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ও সহায়তায়। উৎসুক সাংবাদিকদের অজান্তেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মেহেরপুরের অজানা অচেনা পান্ডব বর্জিত এক আম্রকাননে যেখানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল একটা রঙিন প্রভাত জন্মের ও দর্শনের আশায়, প্রতীক্ষায়। ৫০ এর অধিক গাড়ির কাফেলা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মধ্যাহ্নর একটু আগে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, কর্নেল ও এম এন এ এম এ জি ওসমানী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আমিনুল হক বাদশা, এম আর আখতার মুকুল, এসডিও ওয়ালীউল ইসলাম, সাঁতারু ব্রজেন দাস, ছাত্রনেতা জনাব নুর-এ আলম সিদ্দিকী, আ.স.ম আব্দুর রব সহ আরো অনেকে। আর তাদেরকে অধীর আগ্রহে- অপেক্ষায় গ্রহণ করেছিলেন মেহেরপুরের তৎকালীন এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী আর অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আর দূর দূরান্ত থেকে আসা এলাকার ও এলাকার বাইরের অসংখ্য মানুষ।

ডাক্তার আসহাবুল হক, রওশন আলী, সহি উদ্দিন, নুরুল হক, ব্যারিস্টার বাদল রশিদের মত অসংখ্য নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, মোস্তফা মহসিন মন্টু, কামরুল আলম খান খসরু, সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান, ক্যাপ্টেন এ.টি.এম আব্দুল ওহাব ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর লে. কর্নেল মেঘ সিং, কলিকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক মানস ঘোষ, যুগান্তর পত্রিকার সংবাদদাতা সুখরঞ্জন সেন, আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা গৌর কিশোর ঘোষসহ অসংখ্য স্বাধীনতাকামী মানুষ দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় অফুরন্ত সাহস নিয়ে সম্ভাব্য পাকিস্তানি আক্রমণের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

সভাপতি
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাণী

আজ ১৭ এপ্রিল, ২০২১ ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস'। জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীনতার মহান স্থপতি মহাকালের মহানায়ক, সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারি তার পরিবারের সদস্যগণকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ৩০ লক্ষ শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকসহ সকল জনগণকে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। শ্রদ্ধা জানাই সম্ভ্রমহারা দুই লক্ষাধিক মা-বোনদের।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বন্দি থাকায় ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এছাড়াও তাজউদ্দিন আহমদ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশ্বখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর হিসাবে পরিচিত খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশের দখলদার পাকিস্তানি হানাদার সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার জন্য কত রক্ত দিতে হয় তা আমাদের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'কান্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় এভাবে বলেছেন–

"কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পূনর্বার।"

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রক্ত-রাঙিয়ে কেনা স্বাধীনতার ৫০ বছরে পর্দাপন করেছে। এ সময়ে মুজিবনগর সরকারের চেতনার উত্তরাধিকারী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। বাংলার মানুষকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় 'ভিশন ২০২১' এবং 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়ন করে চলছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্ম দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবসে' এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

শাজাহান খান, এমপি

টাঙ্গাইলের মান্নান সাহেবের মুন্সিয়ানায় পরিচালিত, দারিদ্র্যপীড়িত বিভিন্ন বাসগৃহ ও স্থানীয় খ্রিস্টান গির্জা থেকে সংগৃহীত খাট, চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্রের মলিনতায় পীড়িত কিন্তু অসংখ্য মানুষের হৃদয় নিক্কনে উজ্জীবিত মঞ্চে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ থেকে বিভিন্ন পর্বে আমাদের সংগ্রামের ভীত যখন শক্ত হচ্ছিল তখন ওই জনারণ্যে সম্মিলিত কণ্ঠে বারে বারে এক অনির্বচনীয় শক্তি বিকীরিত হচ্ছিল। উৎসব আনন্দে উচ্ছল এক স্বর্গীয় মহিমা ঠিকরে পড়ছিল দশ দিশায়। জনতা যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর তখন মঞ্চে উঠে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ উচ্চারণ করলেন এক অমোগ ঐতিহাসিক বার্তা, "আজ থেকে এই জায়গার নাম হবে মুজিবনগর। এটাই হবে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। এখান থেকে পরিচালিত হবে সকল সরকারি কার্যক্রম।" জনগণ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান আর মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে ফেটে পড়লো, স্বাগত জানালো এই বার্তাকে। এই বার্তার সাথে তিনি আরো বার্তা দিলেন, "নূরুল কাদের খান হবেন এই সরকারের সংস্থাপন সচিব এবং কর্নেল ওসমানী এম.পি হবেন প্রধান সেনাপতি।" জনগণ আবারও করতালির মধ্যে স্বাগত জানাল এই বার্তা কে। তাজউদ্দিন সাহেবের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। অতঃপর জনগণ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন। নেতৃবৃন্দকে অতি সাধারণ ডাল খিচুড়ি দিয়ে আপ্যায়নের জন্য আমাদের স্থানীয় ইপিআর বিওপিতে আহবান করে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে আগত অতিথিদের নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। সাংবাদিকগণ কলকাতায় গিয়ে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই অভাবনীয় ঘটনার কথা জানিয়ে দিলেন। ১৭ই এপ্রিল, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, এভাবেই আইনি ভিত্তি পেল। আর এই অনুষ্ঠানে সামরিক অভিবাদনের (গার্ড অভ অনার) নেতৃত্ব দিয়ে আমিও এই ঐতিহাসিক ঘটনার একজন অংশীদার হয়ে গেলাম। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ত্রিভুজাকৃতি এক এনক্লেভের মধ্যে সীমান্ত রেখা থাকে মাত্র ৩০০ গজ দূরত্বে ঐ দিন যে ঘটনাটা ঘটেছিল সে দুর্লভ ঐতিহাসিক ঘটনার গর্বিত অংশীদার হয়ে আজও আমি একজন মুক্তিযুদ্ধের জীবিত "আইকন"।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ❑